মদীনার নারী সমাজের প্রতি হৃদয়স্পর্শী খুতবা

নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর খুতবাটি রোগশয্যা অবস্থাতে প্রদান করেছেন। যে অসুস্থ অবস্থা থেকে তিনি আর কখনও আরোগ্য লাভ করেন নি এবং স্বীয় পবিত্র আত্মাকে মহান স্রষ্টার নিকট সমর্পন করেছেন।

প্রথম খুতবাটি সুস্থাবস্থায় মসজিদে নববীতে আনসার ও মুহাজির পুরুষদের সমবেশে দান করেছেন।[1] আর দ্বিতীয় খুতবাটি গৃহাভ্যন্তরে অসুস্থাবস্থায় আনসার ও মুহাজিরদের স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে দান করেছেন।

এ দু'টি খুতবার শ্রোতারা, স্থান কাল ও তার শারিরীক অবস্থা সব কিছুই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু খুতবা দু'টির ভাষা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, এগুলো অপরিসীম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা এবং বেদনার্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রতিটি খুতবাই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ দৃঢ়চেতা ও প্রতিবাদমূখর। কিন্তু দ্বিতীয় খুতবাটি, যা আমাদের এখনকার আলোচনার বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিবাদমূখর ও হৃদয়বিদারক।

মূলতঃ এ খুতবাটি নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং এটি তাঁর মমস্পর্শী শোকগাঁথার স্মারক।

এমনই এক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, যা তাঁর অস্তিমজ্জার গভীরে প্রবেশ করেছে এবং সে যন্ত্রণার অগ্নিশিখা তাকে বিদগ্ধ করেছে। আর এজন্যেই তাঁর এ খুতবার বাক্যগুলিতে অগ্নুৎপাত ঘটেছে, কেননা সেগুলো বিদগ্ধ হৃদয় থেকেই উত্থিত হয়েছে। খুতবাটি যেহেতু রক্তঝরা অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেহেতু খুতবার বাক্যগুলিও রক্ত বর্ণ ধারণ করেছে।

এ খুতবার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটি হচ্ছে ঃ রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর উপর অনেক অত্যাচার ও অবিচার হয়েছে। যে সকল অত্যাচারের কারণে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি মদীনার নারী সমাজ যখন তাকে দেখতে আসে ও তাঁর অসুস্থ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই উত্তরে তাঁর অসুস্থতার খবরাখবর জানানোর কথা। কিন্তু এমতাবস্থায় তিনি একটি বাক্যও নিজের অবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ করনে নি। বরং তাঁর খুতবার মূল বিষয়বস্তু ছিল খেলাফতের জবরদখল, আলী (আঃ)-এর প্রতি অবিচার ও মুসলমানদের এহেন বিচ্যুতির ভবিষ্যত ভয়াবহতা প্রসঙ্গে।

আশ্চর্যকর হচ্ছে তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, বরং তাঁর সহধর্মী আলী (আঃ)-এর ব্যথা-বেদনা ও মুসলমানদের সমস্যাবলী সম্পর্কে বলেছেন।

হ্যাঁ, হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর সুমহান আত্মা তা থেকে অনেক উর্ধ্বে যে, নিজের অবস্থা ও ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে (তা যতই ব্যাপকতর হোক না কেন) কোন কিছু বলবেন এবং আপন সুউচ্চ মর্যাদা হতে সামান্য পরিমাণও নিম্নমুখী হবেন। তিনি শুধুমাত্র নিজের সুযোগ্য সহধর্মী আলী (আঃ) ও তাঁর ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

তিনি ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে মোটেও উদ্বিগ্ন ছিলেন না। বরং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্‌ ও তাদের আসন্ন সংকট সম্পর্কে।

সাধারণতঃ মানুষ জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত হলে নিজের অবস্থা ও দুঃখ-দূর্দশা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) তাঁর এ সুদীর্ঘ খুতবাতে একটি বাক্যও নিজের অবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ করেন নি।

---

[1]। অবশ্য যেমনভাবে প্রথম খুতবা শুরুর প্রক্কালে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি পর্দা ঝুলানো ছিল এবং বনী হাশিমের ক'য়েক জন নারীদের সাথে নিয়ে তিনি মসজিদ অভিমুখে আসেন। আর এমতাবস্থায় তিনি পরিপূর্ণ বোরখাবৃত ছিলেন ও বোরখার নিম্নাংশ মাটির সাথে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি পর্দার আড়াঁলে অবস্থান নিয়ে স্বীয় খুতবা আরম্ভ করেন।

উপরোক্ত বিষয়টি হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর মহিমান্বিত মর্যাদা, মহানুভবতা ও উদারতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর এটি মানবেতিহাসে সকল ন্যায়পন্থী, আত্মোৎসর্গী ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যধারী ব্যক্তিদের জন্য চিরন্তন শিক্ষা।

হ্যাঁ, তিনি সর্বদা (বিশেষতঃ নিজের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ মূহূর্তগুলোতে) মোমবাতির ন্যায় নিজেকে দগ্ধ করে সমাজকে আলো দান করেছেন, যাতে করে লোকেরা পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। মূলতঃ তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের বলিষ্ঠ সমর্থক।

ফিদাকের খুতাবাতে (প্রথম খুতবাতে) তিনি আল্লাহ্‌র একাত্ববাদ, সৃষ্টির উৎস, মা'য়াদ (পরকাল), ইসলামী বিধানের দর্শন, রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াতকালের ঘটনাবলী ও তাঁর উপস্থিতির বরকত, খেলাফত দখল এবং মুসলমানদের ভবিষ্যত পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি সামান্য পরিমাণও ফিদাক প্রসঙ্গে আলোচনা করে থাকেন, তবে তা এ কারণে ছিল যে, এ প্রভাবশালী অর্থনৈতিক প্রকল্পটি ইসলাম ও খেলাফতের জন্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শত্রুরা রাসূল (সাঃ)-এর বংশধরকে কোণঠাসা ও দূর্বল করে রাখার উদ্দেশ্যে ফিদাক দখল করেছিল, সেহেতু তিনি উক্ত ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবী জানান।

কিন্তু দ্বিতীয় খুতবাটির (মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীগণের সম্মুখে প্রদত্ত খুতবা) বক্তব্য হচ্ছে খেলাফত ও ইমামতকে কেন্দ্র করে। যেহেতু হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)- এর উপর অনেক অবিচার হয়েছে, সেহতু এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি উক্ত খুতবাতে ন্যায় বিচার কামনা করবেন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য কোন বিচার দাবী অথবা অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। বরং তিনি যা কিছু বলেছেন তা ছিল আলী (আঃ)-এর খেলাফত ও মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

আল্লাহ্‌ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলী-আওলীয়াগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "পূর্ণাঙ্গ আত্মসর্মপণ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও হক পথে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে এতই উৎকর্ষতা সাধিত হয় যে, নিজেকে ভূলে সর্বক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখে।

আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কিছুতে কর্ণপাত করে না। তার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করে না।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে ইসলাম তারপর ঈমান অতঃপর সন্তুষ্টি এবং সর্বশেষ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ। যেমনভাবে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿ قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم﴾

"আরব বেদুঈনরা বলে, আমারা ঈমান এনেছি। (আপনি, হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আন নি, বরং তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ। কেননা, তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নি। [১]

আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

﴿ فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّمو تسليماً ﴾

"তোমর প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা না রাখে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মসমর্পণ করবে।" [২]

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

﴿ انّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً﴾

---

[১]। সূরাঃ হুজুরাত, আয়াত নং ১৪।

[২]। সূরাঃ নিসা, আয়াত নং ৬৫।

"(তারা বলে) আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে সাহায্য করেছি, আর তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতাও চাই না।" [১]

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে তিনি নিজের সব যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ভুলে কেবল আল্লাহ্ সন্তুষ্টি, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

খুতবার বিষয়বস্তুর উপর এ সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকার পর আমরা এখন মূল খুতবার প্রতি দৃষ্টিপাত করব। আমরা এ খুতবাকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে, সেগুলো পৃথক পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করব। তবে প্রথমেই খুতবার সনদ ও দলীলাদির প্রতি দৃষ্টিপাত অত্যন্ত জরুরী ঃ

এ খুতবাটি অনেক প্রসিদ্ধ সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে এটি উল্লেখিত হয়েছে, তম্মধ্যে সাতটি প্রসিদ্ধ সূত্র এখানে উল্লেখ করছি ঃ

(১) হযরত শেখ তাবারসী (রহঃ) এ খুতবাকে তাঁর "ইহতিজায" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২]

(২) আলী ইবনে ঈসা আরবেলী (রহঃ) এ খুতবাটি "সাহীফে" গ্রন্থ থেকে স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কাশফুল গাম্মাহ্"তে বর্ণনা করেছেন।

(৩) আল্লামা মাজলিসী (রহঃ) "বিহারুল আনওয়ার" গ্রন্থে এ খুতবাটি বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[৩]

(৪) এ খুতবাটি "মায়ানিউল আখ্‌বার" গ্রন্থে হযরত শেখ সাদূক (রহঃ) নিম্নোলিখিত[৪] সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুল্লাহ্ বিন হাসান (রহঃ) তাঁর মাতা ও ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(৫) পূর্বোক্ত গ্রন্থে অপর একটি সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

(৬) শেখ তুসী (রহঃ) এটি তাঁর "আমেলী" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৭) প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী হযরত ইবনে আবীল হাদীদ (রহঃ) এ খুতবাটি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শারহে নাহ্‌জুল বালাগা" তে নিম্নোক্ত [৬] সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং, এ খুতবাটি বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তবে সেটির অনূলিপিসমূহের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে "ইহতিজায" গ্রন্থে যে অনূলিপিটি সাওদ বিন গাফ্‌লাহ্ (রাঃ)[৭] থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেটি তুলনামূলক পূর্ণাঙ্গ। আর এ কারণে আমরা এখানে খুতবার উক্ত অনূলিপিটি নির্বাচন করেছি। (আল্লামা মাজলিসী (রহঃ)ও স্বীয় গ্রন্থ বিহারুল আনওয়ারের ৪৩তম খণ্ডে ১৬১নং পৃষ্ঠায় উক্ত অনূলিপিটি উল্লেখ করেছেন।)

---

[১]। সূরাঃ ইনসান, আয়াত নং ৯।

[২]। কাশফুল গাম্মাহ্ , ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৮।

[৩]। বিহারুল আনওয়ার পৃঃ ১৫৬ খণ্য নং ৪৩।

[৪]। আব্দুল্লাহ বিন আল হাসান (রহঃ) থেকে যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান মাহলাবী (রহঃ), আবু তাঈব মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন হামীদ (রহঃ), আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আল হুসাইনী (রহঃ) এবং আইমান বিন হাসানুল কিতান (রহঃ) এ খুতবাটি বর্ণনা করেছেন।

[৫]। আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) থেকে যথাক্রমে ঈসা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আবু তালিব (রাঃ) , মুহাম্মাদ বিন আলী আল্ হাশেমী (রাঃ) ,জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান (রাঃ) এবং আলী বিন মুহাম্মাদ (রাঃ) [যিনি ইবনে মুগাইরা কাজভীনী নামে প্রসিদ্ধ] উক্ত খুতবাটি বর্ণনা করেছেন।

[৬]। উম্মে ফাতেমা বিনতে হুসাইন (আঃ) থেকে যথাক্রমে আব্দুল্লাহ্ বিন হাসান (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন জাকারিয়াহ্ (রহঃ) এবং আহমাদ বিন আব্দুল আজিজ জাওয়াহেরী (রহঃ) উক্ত খুতবাটি বর্ণনা করেছেন।

[৭]। আল্লামা হিল্লি (রহঃ)-এর বর্ণনানুসারে হযরত সাওদ বিন গাফলাহ্ (রাঃ) ছিলেন আমিরুল মু'মিনীন (আলী)-এর অন্যতম সহযোগী। মিরদামাদী (রহঃ) তাকে আলী (আঃ)-এর বিশেষ সহযোগী হিসেবে অভিহিত করেছেন। জাহাবী (রহঃ) " মুখতাসার " গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ সাওদ বিন গাফ্‌লাহ্ (রাঃ) একজন বিশ্বস্ত প্রজ্ঞাবান, আবেদ, পরহেজগার এবং বহু অনুপম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

অতএব, উপরোক্ত খুতবাটি সে সব প্রসিদ্ধ খুতবাসমূহের অন্তর্ভূক্ত যা বিভিন্ন প্রখ্যাত গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এ খুতবাটি যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ।

এখন মূল খুতবাটি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহকারে উল্লেখ করব, যা অনেক সত্য অনুদঘাটনে সহায়ক হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

لمّا مرضت فاطمة عليها السّلام المرضة اللتي توفيت فيها اجتمع اليها نساءُ المهاجرين والانصار، يعدنها، فقلن لها : كيف اصبحت من علتك يابنة رسول الله ؟

فحمدت الله و صلّت على ابيها (صل الله عليه و آله وسلّم) ثمّ قالت :

اصبحت والله عائفةً لدنيا كنّ ، قالية لرجالكنّ، لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنأتهم بعد ان سبرتهم .

فقبحاً لفلول الحدّ ، واللّعب بعد الجدّ ، و قرع الصّفاة ، و صدع القناة ، و خطل الآراءِ، و زلل الاهواء ﴿ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون ﴾ لا جرم لقد قلّدتهم ربقتها و حمّلتهم اوقتها و شننت عليهم عارها . فجدعاً و عقراً و بعداً للقوم الظّالمين .

"যখন হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যে অসুস্থাজনিত কারণে তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করেন। আনসার ও মুহাজিরদের স্ত্রীগণ তখন তাঁকে দেখার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ঃ অসুস্থ অবস্থাতে আপনি কিভাবে সকাল করেছেন ? (আপনার অসুস্থতার পরিস্থিতি কেমন) হে নবী নন্দিনী ?

তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর পিতা রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অতঃপর বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এমন অবস্থাতে আমার সকাল হয়েছে, যখন

তোমাদের এ দুনিয়ার প্রতি চরম অতিষ্ঠ এবং তোমাদের পুরুষদেরকে আজ শত্রু ভাবী ও তাদের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ।

তাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তাদের প্রতি মনোক্ষুন্ন হয়েছি। এগুলো কতইনা নিন্দনীয় ঃ তরবারীসমূহ ভাঙ্গা (জবরদখলকারীদের প্রতি নীরব থাকা), অক্লান্ত সাধনার পর ক্রীড়ায় লিপ্ত হওয়া (ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যতকে হাস্যাস্পদ বিবেচনা করা), পাথরে আঘাত করা (অফলপ্রসূ কার্যসম্পাদন করা), বল্লমসমূহ চূর্ণ হওয়া (শত্রুদের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা), বিশ্বাসের বিচ্যুতি, ভ্রান্ত চিন্তাধারা এবং প্রত্যয়হীনতা। "কতই না নিকৃষ্ট আমল তারা আগামী দিনের (পূনরুত্থান দিবসের) জন্য পাঠিয়েছে। যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন শাস্তি।" [১]

কাজেই যখন এমনটি দেখলাম তখন সকল দায়দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি। আর তাদের গুনাহের বোঝা তাদেরই ঘাঁড়ে ও কৃতকর্মের প্রতিদান তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

কতইনা উত্তম হতো যদি বিচক্ষণ ও সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বে আসতেন ঃ

প্রায়ই মানুষের জীবনে কিছু স্পর্শকাতর সময়ের আগমণ ঘটে, যেগুলো হচ্ছে তার জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়। অবশ্য আল্লাহ্ কর্তৃক পরীক্ষা মানুষের যোগ্যতা, আত্মিক উৎকর্ষতা, দৃঢ়তা ও অটলতার প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে সঠিক ভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়। আর উক্ত পরীক্ষা মানুষ গৃহীত কোন পরীক্ষার সাথে তুলনীয় নহে, যা সাধারণতঃ পরীক্ষকের অজানাকে জানা ও অন্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ জানার জন্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

নারীকুলের শিরোমণি স্বীয় খুতবার এ পরিচ্ছেদে উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী ও মুনাফাভোগী লোকদের প্রতি তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। সাথে সাথে রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর মুহাজির ও আনসারদের নীরবতা (শুধু নীরবতাই নয়) বরং বিচ্যুত ও পথভ্রষ্টদের সাথে যোগসাজশের কারণে তাদেরকে হুসিয়ার এবং আল্লাহ্র গৃহীত পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

তিনি রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতে তাদের নজিরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা স্মরণ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে ভাঙ্গা তরবারীর সাথে তুলনা করেছেন, যা শত্রুদের মোকাবেলার ক্ষেত্রে কোন শক্তি ও সমর্থ রাখে না। চূর্ণ হওয়া বল্লবের সাথে তুলনা করেছেন, যার কোন কার্যকারিতা নেই।

নবী নন্দিনী (আঃ) তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধান হাস্যাস্পদ ও নিজেদের প্রবৃত্তির ক্রীড়ানকে পরিণত করায় কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন।

নিজেদের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ক্রমশঃ দূর্বলতা এবং বিচ্যুতির গতিধারা মোকাবেলায় চরম অনীহা প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে ভীষণভাবে ভৎসনা করেছেন।

তিনি খুতবার এ পরিচ্ছেদের শেষাংশে তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, খেলাফত দখলের দায়-দায়িত্ব সর্বদাই তাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকবে। রহস্যজনক নীরবতার কলংকিত চিহ্ন স্থায়ীভাবে তাদের কপালে অংকিত থাকবে এবং তা ইসলামের ইতিহাসে এক হৃদয়বিদারক ট্রাজেডী হিসেবে বিবেচিত হবে।

হ্যাঁ, তাদের অনেকেই এ খোদায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সফলকাম হতে পারে নি। এটা কতই না উত্তম ছিল যে, সুদক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বে আসতেন, যাতে করে প্রতারকদের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর এটাও কতইনা চমদপ্রদ যে, কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত হতো, যাতে করে ভেজাল ও প্রলেপযুক্ত স্বর্ণের প্রকৃতরূপ প্রকাশ পেয়ে যেত এবং মানুষের দৃষ্টিতে তা খাটি স্বর্ণের পরিচয় হারাতো।

---

[১]। সূরাঃ মায়িদা, আয়াত নং ৮০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

و يحهم انّى زعزعوها عن رواسي الرسالة و قواعد النبوة والدّلالة، و مهبط الروح الآمين والطبين بامور الدنيا والدين ﴿ آلا ذلك هو الخسران المبين ﴾

وما الّذي نقموا من ابي الحسن عليه السّلام؟

نقموا منه والله نكيير سيفه، و قلّة مبالاته بحتفه ، و شدّة وطأته، و نكال وقعته، تنمره في ذات الله.

و تاالله لو مالوا عن المحجّة الائحة، و زالواعن قبول الحجّة الواضحة، لردّهم اليها، و حملهم عليها ، و لسار بهم سيراً سجحاً، لا يكلم خشاشه، ولا يكلّ سائره ولا يمِلُ راكبه.

ولا وردهم منهلاً نميراً صافياً رويًا تطفح ضفتاه ولا يترنّق جانباه ، ولأ صدرهم بطاناً و نصح لهم سرّاً و اعلاناً .

ولم يكن يتحلّى من الدنيا بطائل، ولا يُحظى منها بنائل، غير ريّ النّاهل و شبعة الكافل، و لبان لهم الزّاهد من الراغب، والصّادق من الكاذب. ﴿ ولو انّ اهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والارض

ولكن كذّبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ ﴿ والّذين ظلموا من هؤلاءِ سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ﴾

"হায়! দূর্ভাগ্য তাদের জন্য! কতই না ধিক্কৃতভাবে খেলাফতকে রেসালাতের সুদৃঢ় পর্বতশৃঙ্গ, নবুওয়াতের অনুপম স্থাপত্য, ওহি ও জিব্রাঈল আমীন (আঃ)-এর অবতরণস্থল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে অধিকতর প্রজ্ঞাবানদের থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। জেনে রেখ! এটাই হচ্ছে চরম ক্ষতি।

আবুল হাসান আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর প্রতি তাদের আপত্তি কি ছিল ?

আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁর ধারালো তরবারী, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে পরোয়া না করা, সুদক্ষ যুদ্ধ কৌশল এবং শত্রুকে বিপর্যস্ত করতে তীব্র আঘাতই ছিল তাদের মূল আপত্তির কারণ।

হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! (যদি খেলাফতের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া হতো) তবে মানুষ কখনই বিচ্যুতির শিকার হতো না এবং সঠিক পথেই বহাল থাকত। সে তাদেরকে অত্যন্ত যোগ্যতা ও নমনীয়তার সাথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করত। আর এ অভিযাত্রাটি কোন রকম বিরক্তিকর হতো না, না বহন কোনরূপ অক্ষমতার শিকার হতো, না আরোহী ক্লান্তবোধ করত।

অতঃপর সে তাদেরকে এক সুস্বাদু ও সুমিষ্ট পানির উৎসের নিকট পৌছে দিত। যে নদীর উভয় কূলে কেবল অথৈ পানি থাকত। যে পানি কখনও দুষিত হত না। অবশেষে সে সেখান থেকে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে ফিরিয়ে আনতো। আর তারা সব সময় তাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে বদান্য প্রদর্শনকারী হিসেবে পেত।

হ্যাঁ, এ দুনিয়া থেকে সে কখনও সুবিধাভোগ করত না, কেবলমাত্র তৃঞ্চার্তদের পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধার্তদের অন্নদানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর এভাবেই তারা বস্তুবাদীদের থেকে পরহেজগার ও মিথ্যাবাদীদের থেকে সত্যবাদীদেরকে সহজেই সনাক্ত করতে পারত।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোনআনে বলেছেন ঃ যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা সবাই ঈমান আনায়ন ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলশ্রুতিতে আমরাও তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করেছি।[১] তিনি আরও বলেছেন, "অতি শিঘ্রই জালিমরা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে। আর তারা কখনও উক্ত শাস্তি হতে পলায়ন করতে পারবে না।[২]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রকৃত মূল্যেবোধ ও পদমর্যাদা ঃ

একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজের সকল বৈশিষ্ট্যাবলী বিশেষতঃ পদ মর্যাদার বন্টন ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক লবিং-গ্রুপিং, সুযোগ সন্ধানীদের তদ্বির, সম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এবং পর্দার অন্তরালে স্বার্থন্বেষী মহলের অবৈধ যোগসাজশ প্রভৃতি উক্ত আদর্শ সমাজের পদ মর্যাদায় সামান্যতম গুরুত্ব রাখে না।

নারীকুলের শিরোমণি স্বীয় খুতবার এ পরিচ্ছেদে মদীনার নারী সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ কেন ? কোন অধিকারে তোমাদের স্বামীরা রাসূল (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা ও দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও খেলাফতের মোড়কে অন্য দিকে প্রবাহিত করেছে ? আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)-এর ক্রটি কী ছিল ? শরিরীক ও মানসিক উভয় দিক থেকে তাঁর মাঝে কী কোনরূপ অপূর্ণাঙ্গতা ছিল ?

---

[১]। সূরাঃ আ'রাফ, আয়াত নং ৯৬।

[২]। সূরাঃ যুম্র, আয়াত নং ৫১।

হ্যাঁ, তাঁর দোষ শুধু এটাই ছিল যে, তাঁর ধারালো তরবারী ইসলামের শত্রুদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন ও মৃত্যুর প্রতি কোন তোয়াক্কা না করা তাকে ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় এক অপ্রতিরোধ্য দূর্জয় মহাবীরে পরিণত করেছিল।

তাঁর দোষ হচ্ছে যে, সে কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই মনোযোগী ছিল ও

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি। তাঁর শৌর্য-বীর্য ও ক্রোধ সব কিছুই ছিল আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত।

মূলতঃ নারীকুলের শিরোমণি উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এ বাস্তবতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটেছে। আর আনসার ও মুহাজিরদের মন-মানসিকতার বিচ্যুতির কারণেই ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধের অমৃত সুধা তাদের কাছে মাকাল ফলের ন্যায় তিক্তকর মনে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একজন সুযোগ্য ও আদর্শবান নেতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাদের দৃষ্টিতে দোষনীয় বিবেচিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি তাঁর খুতবার ধারাবাহিকতায় তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আলী (আঃ) কে উপেক্ষার মাধ্যমে তারা কতই না বিশাল নেয়ামত ও অনুগ্রহকে হারিয়েছে। কেননা, আলী (আঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত ও আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন।

তিনি হক ও বাতিলকে অন্যদের অপেক্ষা সর্বোত্তম পন্থায় সনাক্ত ও পৃথক করতে পারতেন। যদি শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পিত হতো, তবে তিনি কখনও মুশরিকদের অবশিষ্ট অনুচরদেরকে (ইসলাম ও কোরআনের ঘোর দুশমন আবু সুফিয়ানের বংশধর) ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ এবং সেটাকে একটি স্বেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্রে (যা ইতিহাসের ধিক্কৃত স্বৈরশাসক কাসরী ও কায়সারের রাজতন্ত্র অপেক্ষাও নিন্দনীয়) পরিণত হতে দিতেন না।

যদি তারা শাসন ক্ষমতা আলী (আঃ)-এর হাতে সোপর্দ করত, তবে তিনি তাদেরকে হকের বাহনে আরোহণ করিয়ে অত্যন্ত সুদক্ষ, স্নেহ ও মমতার সাথে সুস্বাদু আবে হায়াতের দিকে নিয়ে যেতেন। অতঃপর তাদেরকে সে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পানির উৎস থেকে পরিতৃপ্ত করানোর মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক ও সৌভাগ্যপূর্ণ জীবনদান করতেন।

একজন আদর্শ ও আধ্যাত্মিক নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতীর প্রতি মহানুভূতিশীল ও তাদের কল্যাণ সাধন করা। তাদের দৃষ্টিতে কী আলী (আঃ) অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিশীল কেহ ছিলেন ? যার সার্বিক চেষ্টা ও সাধনা ছিল তৃষ্ণার্তদের পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধার্তদের অন্নদান করা। জনগণের দুঃখ ও দূর্দশায় তিনি ব্যথিত এবং তাদের শোক ও বেদনায় তিনি শোকার্ত হতেন।

খেলাফত ও ইমামতের পদাধিকারীর অন্যতম শর্ত হচ্ছে পরহেজগারীতা এবং ধন-সম্পদ ও পার্থিব জীবনের প্রতি অনাগ্রতা। কেননা, যদি জাতীর কর্ণধার দুনিয়ার চাকচিক্য ও প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে তা দ্বারা তার মাঝে অনুপ্রবেশ করে তাকে ন্যায় ও সত্য পথ হতে বিচ্যুত করা অত্যন্ত সহজ।

সমস্ত মুসলমানদের মাঝে কেউ কী পরহেজগারীতা ও আধ্যাত্মিকতায় আলী (আঃ)-এর সমপর্যায়ে আসতে পারবে ? যিনি কখনও নিজের জন্য স্বর্ণখচিত পোষাক ও সুসজ্জিত গৃহ প্রস্তুত করেন নি। তাঁর পোষাক ছিল স্বীয় গোলামের পোষাকের সমতুল্য এবং তার খাদ্য ছিল নিঃস্ব ও দরিদ্রতম মানুষের খাদ্যের ন্যায়।

যদি খেলাফতের মানদণ্ড শারীরিক ও মানসিক উপযুক্ততা, উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধতা, পরহেজগারীতা ও আধ্যাত্মিকতা এবং জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিকতা হয়ে থাকে, তবে আলী (আঃ) ব্যতীত এ সকল বৈশিষ্ট্যে যথোপযুক্ত কে ছিলেন ? এ কারণেই তো রাসূল (সাঃ) আলী (আঃ) কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণার পর বারংবার বিভিন্ন হাদীসের এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এ পদে সে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন। শুধু রাসূল (সাঃ) নন,বরং স্বয়ং আল্লাহ্‌ও তাকে এ পদে সুযোগ্য ঘোষণা দিয়েছেন।

নারীকুলের শিরোমণি তাঁর খুতবার এ পরিচ্ছেদের শেষাংশে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা ধারণা কর না এ ধরনের অবহেলা ও অনীহা এবং খেলাফতের পদে জাতীর সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অসমর্থন, তোমদের জন্য কোন পরিণামই বয়ে আনবে না। তোমাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক পরিণতির

অপেক্ষা এবং তা ভোগ করতে হবে। তোমরা কখনও যেন এমনটিও ধারণা কর না যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব হতে পরিত্রাণ পাবে, না তা আদৌ সম্ভবপর নয়।

হ্যাঁ, তারা যে ফসল রোপণ করেছে, পরিশেষে অবশ্যই সেটার ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে। স্বৈরাচার, অত্যাচার, ফাসেদ ও পাষাণ্ড শাসকবর্গ যেমন ঃ বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীদের রাজতন্ত্রের যাতাকলে তাদেরকে পিষ্ঠ হতে হবে এবং সেদিন পলানোর কোন সুযোগ থাকবে না। আর আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক আযাব তো অবশ্যম্ভবী বিষয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الا هلّم فاستمع وما عشت اراك الدهر عجباً ، و ان تعجب فعجب قولهم.

ليت شعري ؟ الى ايّ سناد استندوا ؟ و على ايّ عماد اعتمدوا ؟ و بايّةٍ عروةٍ تمسّكوا ؟ و على ايّة ذرّيـــةٍ اقدموا واحتنكوا ؟

﴿ لبئس المولى و لبئس العشير ﴾ و ﴿ بئس للظالمين بدلاً ﴾

استبدلوا والله الذنابى بالقوادم، والعجز بالكاهل ، فرغماً لمعاطس قوم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً، ﴿ الا انّهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾ ويحهم ! ﴿ أفمن يهدى الى الحق احق ان يتّبع امّن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ﴾

“এখন শোন! (তাদের ভিত্তিহীন দলীল প্রসঙ্গে) যত বেশি দিন বাচবে, তত অধিক বিস্ময়কর বিষয় দেখতে পাবে। যদি বিস্মৃত হতে চাও, তবে তাদের কথাতে বিস্ময় প্রকাশ কর (খেলাফতের প্রসঙ্গে তাদের উদ্ভট যুক্তিতে বিস্ময়বোধ কর)।

হায়! যদি জানতাম তাদের সনদের উৎস কোথায়? কোন ভিত্তির উপর তারা নির্ভর করছে ? এবং কোন বংশধরের প্রতি ভরসা করে অধিপত্য কা’য়েম করেছে ? (পবিত্র কোরআনের ভাষায়) “কতই না নিকৃষ্ট তাদের নেতা এবং কতই না নিকৃষ্ট তাদের সাথীরা।”[১] “জালিমদের জন্য কতই না ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করছে।”[২]

তারা অগ্রগামীদেরকে উপেক্ষা করে পশ্চাতগামীদেরকে অনুসরণ করেছে এবং উত্তমকে প্রত্যাখ্যান করে অধমের পিছে ছুটছে। যারা মন্দ কর্ম সম্পাদন করেছে অথচ ধারণা করছে যে, উত্তম কর্ম সম্পাদন করছে শিঘ্রই তাদের নাকে খত লাগবে। (কোরআনের ভাষায়) “জেনে রেখ ! এরাই হচ্ছে ফাসেদ, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।”[৩]

হায়! দুর্ভাগ্য তাদের জন্যে, (পবিত্র কোরআনের ভাষায়) “যে হকের প্রতি অন্যদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে সে অধিকতর অনুসরণযোগ্য নাকি যাকে হকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয় ? তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা কেমনভাবে বিচার করছ ?”[৪]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

শ্রেষ্ঠত্বের উপর অশ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য ঃ

জ্ঞান ও বিবেকের অস্বীকারকারী ব্যতীত কারও পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের উপর অশ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া সম্ভবপর নহে। আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীসম্পন্ন বস্তুকে অপর কোন বৈশিষ্ট্যহীন বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কারও মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

এমনটি কী কখনও শুনেছেন যে, একজন যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের সময় ছাত্রকে শিক্ষকের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ? অথবা রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরিবর্তে কখনও কী একজন সাধারণ ও অনভিজ্ঞ ডাক্তারকে প্রাধান্য দেয়া হয় ? (অবশ্য যদি কোন ব্যতিক্রমী বিষয় থেকে না থাকে।) কোন প্রশাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা কী একজন অভিক্ষ ও দক্ষ ব্যবস্থাপককে প্রত্যাখ্যান করে কোন নবীন ও অনভিক্ষ ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারি? না, আমদের সাধারণ জ্ঞান তা কখনও অনুমোতি দেয় না।

এমন কি যারা শ্রেষ্ঠত্বের উপর অশ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য দেওয়াকে কোন দোষনীয় বিষয় মনে করে না, তারাও কখনও বাস্তবে উপরোক্ত নিয়মের লংঘন করবে না। বরং সর্বদাই অপেক্ষাকৃত উত্তম বস্তুকে গ্রহণ করবে।

এছাড়া ফলক্রয়ের সময় কেহ কী কখনও ভাল মিষ্টি ফলসমূহ বর্জন করে মন্দ ও পচা ফলসমূহ গ্রহণ করবে ? অথবা বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী অসৎ ও দুঃচরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে সৎ ও স্বনামধণ্য ব্যক্তিদের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় ? কেউ কী কখনও সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পানির পরিবর্তে ময়লা ও দুষিত পানিকে প্রাধান্য দেয় ? পক্ষান্তরে কেউ যদি এমনটি করে, তবে তার জ্ঞান শুণ্যতার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

সুতরাং, উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় নিয়মটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়। এ নিয়মটি প্রত্যেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মেনে চলে এবং কখনও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। কিন্তু কখনও কখনও সমাজে এমন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, কেবল ভ্রান্ত মূল্যবোধেরই প্রকাশ ঘটে না, বরং মূল্যবোধ বিরোধী বিষয়গুলোও মূল্যবোধের স্থান দখল করে নেয়। আর লোকেরা প্রজ্ঞাবান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তদস্থলে বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তিকে গ্রহণ করে।

হ্যাঁ, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি কখনও কখনও মানুষের অনুভব শক্তিকে এতই অকার্যকর করে দেয় যে, নিজেদের প্রকৃত বৃহৎ স্বার্থকে অনায়াশে বিসর্জন দেয়। আর তখন এমনই জঘণ্য পদক্ষেপ জড়িয়ে পড়ে, যার ফলশ্রুতিতে উত্তমকে ছেড়ে অধমকে গ্রহণ করে থাকে।

---

[১]। সূরাঃ হজ্জ, আয়াত নং ১৩।
[২]। সূরাঃ কাহাফ্ আয়াত নং ৫০।
[৩]। সূরাঃ বাক্বারা, আয়াত নং ১২।
[৪]। সূরাঃ ইউনুস, আয়াত নং ৩৫।

পবিত্র কোরআন যে সমস্ত মুশরিক ও কাফিররা এ ধরনের নিন্দনীয় ও মূর্খতাপূর্ণ কার্য সম্পাদন করত তাদেরকে লক্ষ্য করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে ঃ

﴿أفمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امّن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون﴾

"যে হকের প্রতি অন্যদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়, সে অনুসরণযোগ্য নাকি যাকে হকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয় ? তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা কেমন বিচার করছ ?[১]

নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) স্বীয় অনবদ্য ও হৃদয়স্পর্শী খুতবার এ পরিচ্ছেদে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) উপরোক্ত বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

হে আনসার ও মুহাজির গোত্রের লোকেরা! কেন ইসলামের অগ্রসেনানী ও পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপনকারীকে উপেক্ষা করে তাদের পিছে ছুটেছ যারা আদৌ এ মহান সৌভাগ্যের অধিকারী নহে? (বরং তারা ইসলামের অতুজ্জ্বল সূর্যোদয়ের অনেক বছর পর পর্যন্ত মূর্তি পূজারী ছিল।)

কেন রাসূল (সাঃ)-এর জ্ঞান নগরীর তোরণদ্বার (باب مدينة العلم النّبي صل الله عليـــه) আলী এবং রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী (اقــضاكم علــيٌّ) "আলী হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক" এতদাসত্ত্বেও তাকে প্রত্যাখ্যান করে ঐ সকল ব্যক্তিদের আনুগত্য করছ, যারা কখনও এরূপ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল না ?

তোমরা এ পদক্ষেপের মাধ্যমে অশ্রেষ্ঠত্বের উপর শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্যের নিয়মকে ভঙ্গ করেছ। আর এভাবে তোমরা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত (পূর্বোক্ত আয়াতের আলোকে) উপেক্ষা করেছ।[২]

নারীকুলের শিরোমণি উপরোক্ত বিষয়ের কারণে অতিশয় বিস্ময়বোধ এবং এ পৃথিবীকে এক বিস্ময়কর জগত হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানে প্রতিদিন মানুষের আয়ু যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই নব নব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করছে।

তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা খেলাফতের প্রকৃত ধারাকে পরিবর্তন এবং আলী (আঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন দলীলের প্রতি রুজু করেছে ? তারা কোন সূত্রের উপর নির্ভর করেছে ? আর কিভাবে তারা আলী (আঃ)-এর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী উপেক্ষা করে অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে তাঁর উপর প্রাধান্য দিয়েছে ?

তিনি খুতবার এ পরিচ্ছেদের শেষাংশে তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

﴿ لبئس المولى و لبئس العشير﴾ و ﴿ بئس للظالمين بدلاً ﴾

"কতই না নিকৃষ্ট তাদের নেতা এবং কতইনা নিকৃষ্ট তাদের সাথীরা।"[৩] আর "জালিমদের জন্য কতই না মন্দ পরিণতি অপেক্ষ করছে।"[৪]

---

[১]। সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৩৫।

[২]। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে ইবনে আবীল হাদীদ (রহঃ)স্বীয় গ্রন্থে বর্ণিত খুতবার অত্র অংশে এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন ঃ « الحمدلله الّذي قدم المفضول على الفاضل» " সকল হামদ ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে যিনি অখ্যাত ব্যক্তিকে বিখ্যাত ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

[৩]। সূরা হজ্ব, আয়াত নং ১৩।

[৪]। সূরা কাহাফ, আয়াত নং ৫০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

اما لعمري لقد لقحت ، فنظرة ريثما تنتج ، ثمّ احتلبوا ملأ القعب دما عبيطاً، و ذعافاً مبيداً، هنالك يخسر المبطلون و يعرف التالون غبّ ما اسّس الاوّلون ، ثمّ طيبوا عن دنياكم انفساً و اطمئنوا للفتنة جأشا.

و ابشروا بسيف صارم ، و سطوة معتدٍ غاشمٍ ، و بهرجٍ شاملٍ، و استبدادٍ من الظالمين يدع فيئكم زهيدا، و جمعكم حصيدا . فيا حسرة لكم و انّى بكم و قد عميت عليكم ؟ ﴿ انلزمكموها و انتم لها كارهون ﴾

“জেনে রেখ! আমার অস্তিত্বের শপথ! খেলাফতের উটটি এখন গর্ভবতী হয়ে গেছে। অপেক্ষা কর বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতেই সে নবজাতক ভূমিষ্ঠ করবে। (তখন বুঝতে পারবে যে, কিরূপ নবজাতক ভূমিষ্ঠ করেছে।) অতঃপর দুগ্ধ দোহনের পরিবর্তে পাত্রভর্তি তাজা ও বিষাক্ত রক্ত দোহন করিও (অথবা তাতে চুমুক দিও।) আর তখন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্থের শিকার হবে।

হ্যাঁ, পরিশেষে বাতিল পথের অন্ধ অনুসারীরা তাদের নেতাদের প্রস্তুতকৃত ভয়াবহ পরিণতি অনুভব করবে (তারা নিজেদের অস্তিত্বে তার কুফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে।)

যাও, এখন থেকে এ দুনিয়া নিয়েই মত্ত থাক এবং সেটার প্রতি আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাক। কিন্তু তোমাদের সামনে যে, কঠিন পরীক্ষা ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে, তার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত রেখ।

ধারালো তরবারীসমূহ আগ্রাসনবাদীদের কর্তৃত্ব, অত্যাচারী ও রক্তশোষক, বিশৃংখলা বিস্তারকারী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠণ ও প্রাণহননকারী এ হুকুমত নিয়ে খুশি থেকো।

হায়! আফসোস তোমাদের জন্যে, কিভাবে পরিত্রাণের আশা করছ, যখন তোমাদের নিকট প্রকৃত বাস্তবতা অপ্রকাশিত রয়েছে এবং তোমরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ? (পবিত্র কোরআনের ভাষায়) “আমরা কী তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল (সত্য) গ্রহণে বাধ্য করব, যখন তোমাদের তা গ্রহণে অনীহা রয়েছে ?”[১]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

ভুল নির্বাচনের অশুভ ফল ঃ

অনেকে এমনটি ধারণা করে থাকে যে, যদি বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া হয়, তবে বাস্তবতাও তাদেরকে ভুলে যাবে এবং ধাওয়া করবে না।

তারা এমনও ধারণা করে যে, অশুভ বীজ রোপন করে শুভ ফসল ঘরে তুলবে। অথচ এক্ষেত্রে কবির পংতিটি অত্যন্ত যথোপযুক্ত ঃ

ফুলের বীচ ছড়িয়েছো, পরিশেষে ফুটেছে ফুল

তার উপর গেয়ে চলেছে হাজারো বুলবুল,

কাঁটাগাছ উপড়ানোর ফল হচ্ছে কাঁটার আচড় খাওয়া

---

[১]। সূরাঃ হুদ, আয়াত নং ২৮।

কাঁটা, কাঁটা বৈ দিতে পারে কি সাড়া?

নিজের অন্তরে মল্লযুদ্ধ করে চলেছো কাঁটার সাথে

অবশেষে কাঁটাই হল কাল দুঃখ দূর্দশা হয়ে এল তোমার কপালে।

হ্যাঁ, কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তাদের এ সব ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ঘুনে ধরা জরাজীর্ণ গৃহের ন্যায় ধ্বসে পড়ে অথবা পানির উপরিভাগে জমে থাকা ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদের ন্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। নতুবা স্বপ্ন বা কল্পণার ন্যায়, যা ঘুম ভাংগার সাথে সাথেই সমাপ্ত এবং তার কদাকার চেহারা ও অশুভ বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যায় (যা মূলতঃ মানুষের মন্দ কর্মের ফসল)। আর এভাবে তারা নিজেদের মন্দ ও ভ্রান্ত কর্মের তিক্তকর স্বাদ আস্বাদন করবে।

হ্যাঁ, বিশ্বজগতের এ সর্বজনীন নিয়ম ইতিহাসের সূচনা থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে এবং মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে তাদের ধর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে থাকে। তাদের মধুময় জীবনকে মাকাল ফল এবং সুখকর স্বপ্নকে ভীতিকর ও দুঃস্বপ্নে পরিণত করে থাকে।

নারীকুলের শিরোমণি ফাতেমা (আঃ) অত্র খুতবার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদেরকে এভাবে সচেতন করে দিয়েছেন ঃ

খেলাফতের উঠটি পথচ্যুতির পর অতিশিঘ্রই গর্ভবতি হবে এবং এক অদ্ভূত নবজাতক ভূমিষ্ঠ করবে। তখন সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর দুগ্ধপাণের পরিবর্তে পাত্রভর্তি তাজা রক্ত তোমাদেরকে দান করবে এবং তোমাদের অন্তরসমূহ এ তাজা রক্তে পরিপূর্ণ হবে। তখন সুমিষ্ট দুগ্ধের পরিবর্তে বিষাক্ত বিষ তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবে।

অর্থাৎ ধীরে ধীরে ইতিহাসের জঘণ্য অত্যাচারী আবু সুফিয়ান, হাজ্জাজ, ইবনে আশ্‌য়াস ও তাদের সন্তানাদি এমনকি তাদের থেকেও জঘণ্যতম রক্ত শোষকদের শাসনকাল ধেয়ে আসবে। আর তাদের ধারালো তরবারীর আঘাত তোমাদের ও তোমাদের সন্তানাদির ঘাড়ে নেমে আসবে এবং তারা তোমাদের জীবনের সবুজ শস্য ক্ষেত তাদের ধারালো কাচির মাধ্যমে পরিস্কার করবে।

তারা শুধু তোমাদের সম্পদ লুন্ঠণ ও তোমাদের নারীদের বন্দী করেই ক্ষ্যান্ত হবে না। বরং ধারাবাহিক ভাবে গণহত্যার মাধ্যমে তোমাদের রক্তে এ পৃথিবীর ভূমিকে রঞ্জিত করবে এমনকি পবিত্র মসজিদে নববীতেও। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পবিত্র হারাম শরীফ মসজিদে নববীর অভ্যন্তরেও তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের এমন নির্মমভাবে হত্যা করবে যে, মসজিদ চত্তর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এমনকি খানা-এ-ক্বাবার পবিত্রতার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই তার বাহির ও অভ্যন্তরে তীর ধণুকের মাধ্যমে তোমাদেরকে শিকার করবে।

তোমরা ধারণা করেছ যে, যদি ভিত্তিহীন অজুহাতের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্তের প্রতি সমর্থন দেওয়া হতে বিরত থাক, তবে আল্লাহ্ আযাব হতে পরিত্রাণ পাবে এবং তোমাদের ন্যাক্কারজনক আমলের পরিণতি হতে পলাতে পারবে। হায়! এটা কতই না ভ্রান্ত ধারণা! হায়! কতই না উদ্ভট কল্পণা!

আজ... হ্যাঁ, আজ আমরা যতই অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, ততই নারীকুলের শিরোমণির এ জ্ঞানগর্ভ খুতবার বাস্তবতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, খেলাফতের প্রকৃত ধারা পরিবর্তেনের কী জঘণ্যতম পরিণতি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বয়ে এনেছে ? কিভাবে জাহেলী যুগের অবশিষ্ট দুর্বৃত্তদের হাতে তাদের জান, মাল ও সম্ভ্রম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর ইসলামের পবিত্র বিধান ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছিল?

বনী উমাইয়ার সাঙ্গপাঙ্গরা ছোট ও বড় কারও উপর কোন দয়া করে নি, তারা না খানা-এ-ক্বাবার পবিত্রতা রক্ষা করেছে,না মসজিদে নববীর। না, মুহাজিরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, না আনসারদের প্রতি। যে আবু সুফিয়ানের সন্তানরা নিজেদের সহযোগীদের প্রতি এভাবে নসিহত করতঃ

« تلقفوها يا بني امية تلقف الكرة فوالّذي يحلف به ابو سفيان ما من جنةٍ ولا نارٍ »

“হে বনী উমাইয়া! খেলাফতের বলকে মাঠ থেকে ছিনিয়ে নাও। শপথ ঐ জিনিষের যার প্রতি আবু সুফিয়ান আজও অটল রয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা করে বলে ঃ না কোন বেহেশ্ত আছে,না কোন দোজখ।”

অতএব, তাদের থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে। আর এ আবু সুফিয়ানের সন্তান মাবিয়া বলেছে ঃ

« ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا... بل قاتلتكم لاتأمّر عليكم »

“আমি তোমাদের সাথে নামাজ ও রোজা কা’য়েমের জন্য যুদ্ধ করে নি। বরং আমি তোমাদের সাথে এ জন্য যুদ্ধ করেছি যে, তোমাদের উপর হুকুমত করব।”

সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি, যা প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী ইবনে আবীল হাদীদ (রহঃ) হযরত জুবাইয়ের বিন বকার (রাঃ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি কিছু বিখ্যাত সুন্নী মনীষীদের দৃষ্টিতে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মাবিয়ার অবিশ্বাসের সুস্পষ্ট সনদ হিসেবে পরিগণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

মুগাইরা বিন শা'য়েবের সন্তান বর্ণনা করেন ঃ আমার পিতার সাথে মাবিয়ার নিকট যেতাম। আমার পিতা প্রায়ই মাবিয়ার নিকট যেত এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তার জ্ঞান ও সচেতনা সম্পর্কে অনেক কিছু বলত। হঠাৎ করে এক রাত্রে সে খাদ্য ভক্ষণে বিরত থাকে এবং ভীষণ মনোক্ষুন্ন ছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং তার নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল ঃ হে পুত্র! আমি এখন এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, যে হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ঈমানহীন ও দূষিত।

আমি বল্লাম ঃ কি বলছ ?

সে বলল ঃ আমি মাবিয়ার সাথে একাকী বসে ছিলাম এবং তাকে বললাম ঃ তুমি এখন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছ। যদি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর এবং পরহিতৈষির বিস্তার ঘটাও, তবে তা তোমার জন্যেই কল্যাণকর হবে। যেহেতু তুমি এখন বয়োবৃদ্ধ হয়েছ , সেহেতু যদি বনী হাশিমের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ কর, তবে তা খুবই উত্তম হবে। কেননা, বর্তমানে তাদের পক্ষ থেকে তোমার জন্য কোন বিপদের সম্ভবনা নেই। আর এমনটি যদি সম্পাদন কর , তবে তা পরকালে তোমার জন্যে সওয়াব ও পূর্ণ্যের কারণ হবে।

মাবিয়া জবাবে বলল ঃ আমি কিরূপে নিজের নাম বহাল থাকার ব্যাপারে আশা পোষণ করতে পারি ? প্রথম জন (প্রথম খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করে) ইসলামী রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে ন্যায় বিচার কা’য়েম করল এবং যা কিছু করণীয় ছিল, তা সম্পাদন করল। কিন্তু যখন সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তখন তার নামও সবাই ভুলে যায়। শুধুমাত্র বলা হয় ঃ আবু বকর। অতঃপর দ্বিতীয়জন (দ্বিতীয় খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করে) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ দশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু যখনই এ ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়, তখন তার নামও মুছে যায়। কেবল বলা হয়ে থাকে ঃ উমর।

অথচ ইবনে আবী কাবশের নাম (রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে) প্রতিদিন পাঁচ বার সুউচ্চ স্বরে প্রতিধ্বনিত হয় ঃ

اشهد انّ محمداً رسول الله

এমতাবস্থায় কোন্ কল্যাণকর্ম ও কোন্ উত্তম নাম বহাল থাকতে পারে? ওহে ব্যক্তিত্বহীন! আল্লাহ্র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংশ না হয়। (এ উক্তিটি অত্র বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, রাসূল (সাঃ)-এর নাম মোবারক ধ্বংশের পায়তারা করা হয়েছে।)[১]

অবশেষে আবু সুফিয়ানের পাপিষ্ট নাতি ইয়াজীদ অত্যন্ত উদ্ধত্যপূর্ণ ও নগ্নভাবে এ শ্লোকটি পাঠ করে ঃ

لعبت هاشم بالملك فلا   خبر جاء ولا وحي نزل

১। ইবনে আবীল হাদীদ (রহঃ) রচিত “ শারহে নাহজুল বালাগা” খণ্ড ৫ম, পৃঃ ১২৭।

“বনী হাশিম রাজত্ব নিয়ে খেলা করেছে এবং তাদের সকল কথা সেটাকে ঘিরেই ছিল। প্রকৃতঃপক্ষে (আসমান থেকে) কোন নির্দেশ ও ওহী নাজিল হয় নি।” আর এভাবে সে স্বীয় নানা আবু সুফিয়ানের সকল নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী ও অপরাধ কর্মের হুবহু পুনরাবৃত্তি ও পুরাপুরি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

বনী উমাইয়াদের শাসনকালে জেল খানাসমূহের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এবং বন্দীদের উপর যে অমানষিক ও নির্মম নির্যাতন চালানো হতো, তা কেবল ইসলামের ইতিহাসকেই নয় বরং সমগ্র মানবেতিহাসকেও কলংকিত করেছে। আর এ বিষয়টি তো নারীকুল শিরোমণির ভবিষ্যত বাণীরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

হ্যাঁ, হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে ভবিষ্যত ঘটনাপ্রবহ সঠিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি এ খুতবাতে যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যত বাণী করেছেন তা অতি দ্রুতই প্রমাণীত হয়েছে। নিষ্ঠুর ও পাষাণ্ড অধিপত্যকামীরা ধারালো ও নগ্ন তরাবারী নিয়ে জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র তাদের দ্বীন, জান-মাল ও পরিবার পরিজন সব কিছুই নস্যাত করে দিয়েছিল।

বিশৃংখলা ও অশুভ ছাঁয়া সমগ্র মুসলিম সমাজের উপর অধিপত্য বিস্তার করে। মুসলমানরা হকের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে চরম অনীহা ও অবহেলার তিক্তকর স্বাদ আস্বাদন করে। আর যারাই হককে ত্যাগ করে বাতিলকে গ্রহণ করবে তাদের জন্যে রয়েছে এমন কঠোর শাস্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

قال سويد بن غفلة : فاعادت النّساء قولها عليهم السّلام على رجالهنّ فجاء اليها قوم من وجوه المهاجرين والانصار معتذرين و قالوا :

يا سيّدة النساء لو كان ابو الحسن ذكر لنا هذا الآمر من قبل ان نبرم العهد، و نحكم العقد، لما عدلنا عنه الى غيره.

فقالت : اليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم، ولا امر بعد تقصيركم

হযরত সাউদ বিন গাফলাহ্‌ (রাঃ) [এ খুতবার রা’বী] বর্ণনা করেন ঃ মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীগণ নবী নন্দিনী (আঃ)-এর এ অগ্নিঝরা খুতবা শ্রবণের পর ঘরে ফিরে তাদের স্বামীদের নিকট তা পূণরাবৃত্তি করে। ফলশ্রুতিতে একদল মুহাজির ও আনসার তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন ঃ

হে খাতুনে জান্নাত (আঃ)! যদি আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) আমাদেরকে অন্যদের সাথে বাইয়াত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বাইয়াতের প্রস্তাব দিতেন। তাহলে আমরা কখনও তাকে পরিত্যাগ করতাম না। (অন্যদের সাথে বাইয়াত করতাম না।)

নারীকুলের শিরোমণি তাদের এ গুনাহ অপেক্ষা জঘণ্যতম অজুহাত শুনে ভীষণ মনোক্ষুন্ন হন এবং বলেন ঃ চুপ কর! আমার থেকে দূরে সরে যাও! তোমাদের এ মিথ্যা অজুহাত কখনও গ্রহণযোগ্য নহে এবং এত মারাত্মক ভুলের পর এখন আর কোন সুযোগ নেই।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

তিক্ত ও বেদনাকর জবাব ঃ

হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর খুতবা শোনার পর একদল মুহাজির ও আনসার তার নিকট উপস্থিত হয়ে যে, জঘণ্যতম ও বেদনাকর জবাব

প্রদান করে তাতে তার পবিত্র হৃদয় ছুরিকাঘাতের ন্যায় ক্ষত-বিক্ষত হয় আর তাঁর রক্তাশ্রু বাক্যাবলীতে সেটার প্রকাশ পেয়েছে।

এ খুতবার বিষয়বস্তু শ্রবণের পর তাদের মাঝে কম্পণের সৃষ্টি হয় ও ভীষণ লজ্জাবোধ করে এবং ইহকালীন ও পরকালীন আজাবের ভয়ে তারা আতংকিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই তারা অনুমতিসাপেক্ষে নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর নিকট ছুটে আসে এবং যেখানে যে জবাব দান করে তার মূলবক্তব্য ছিল এরূপ ঃ

যদি আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) অন্যদের বাইয়াত প্রস্তাবের পূর্বে আমাদেরকে নিজের প্রতি বাইয়াতের আহ্বান জানাতেন। তবে আমরা নিশ্চয়ই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ, তাকে অভ্যর্থনা এবং তাঁর হুকুমতের প্রতিরক্ষা করতাম। সাথে সাথে তাকে অনুসরণ, তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতাম না। কেননা, এ পদে আমরা তাকে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতর, রাসূল (সাঃ)-এর নিকটতম ও তাঁর সহযোগী হিসেবেই মনে করি।

কিন্তু আফসোস্ ! এখন অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং আমরা অন্যদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। যেহেতু আমরা তাদের আনুগত্যকে মেনে নিয়েছি, সেহেতু প্রত্যাবর্তনের সকল পথ আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

হায়! তারা যদি গুনাহ অপেক্ষাও জঘণ্যতম এ অজুহাতটি নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর নিকট উপস্থান না করত। তাদের এ ন্যাক্কারজনক জবাব ও মিথ্যা অপমানকর অজুহাত তাঁর পবিত্র হৃদয়কে ভীষণভাবে ব্যথিত ও বেদনার্ত করে।

হায়! তারা যদি কমপক্ষে নিজেদের অপরাধের স্বীকার করত এবং উক্ত ভুল পথ হতে সুযোগ বুঝে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিত। আর এ ধরনের নিন্দনীয় ও ভিত্তিহীন অজুহাত হতে বিরত থাকত, কেননা ঃ

প্রথমত ঃ তারা বহুবার স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছে যে,

একমাত্র আলী (আঃ) হচ্ছেন তাঁর পরবর্তি খলিফা ও উত্তরাধিকারী। ফলে এক্ষেত্রে বাইয়াতের কোন প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি বাইয়াত জরুরী হয়ে থাকে তবে কী রাসূল (সাঃ) গাদীরে খুমের ময়দানে আলী (আঃ)-এর পক্ষে তাদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন নি ? গাদীরে খুমের ঘটনা তো কারও কাছে কোন অজানা বিষয় নয়। এটা এমনই এক ঐতিহাসিক ঘটনা যা খুবই স্বল্প ব্যবধানে তারা স্বচখে প্রত্যক্ষ করেছে এবং সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল।

তৃতীয়ত ঃ ধরে নিই যে, তারা রাসূল (সাঃ)-এর বাণী শুনে নি এবং গাদীরে খুমে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু আলী (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি কী তাদের নিকট অজানা ছিল ?

কেন তারা রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর দলে দলে তাঁর নিকট আসে নি। আর যদি পুনরায় বাইয়াতের প্রয়োজন থাকে, তবে কেন তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নি ?

খেলাফত তো আলী (আঃ)-এর ব্যক্তিগত কোন সম্পদ নহে যে, তা মালিকানা দাবীর প্রয়োজন হবে। খেলাফত ইসলামী সমাজের একটি সাধারণ অধিকার। বরং এটি সমগ্র ইসলামের সাথে জড়িত। আর এ কারণেই আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে রাসূল (সাঃ) তাকে এ মহান পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

আলী (আঃ)-এর পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ ও তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এ দু'টিই মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে "কেন ও কিভাবে" "যদি ও তবে" এবং "এমন ও তেমন" কোন অর্থ রাখে না।

চতুর্থ ঃ ধরে নিই যে, আলী (আঃ)-এর জন্যে জনগণের প্রতি বাইয়াতের প্রস্তাব দেওয়া জরুরী ছিল। তবে এটা কী আদৌ সমীচীন হবে যে, রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র দেহ মোবারক জমিনে পড়ে থাকবে এবং সে তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন না করেই খেলাফতের দাবী উত্থাপন করবে ?

এটা কতই না ধৃষ্টান্তপূর্ণ চক্রান্ত ছিল যে, একদল রাসূল (সাঃ)-এর দাফন-কাফনের অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করেই খলিফা নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেন ?

পঞ্চম ঃ উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও যদি ধরেই নিই খলিফা নির্বাচনের পর তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এ নির্বাচনে চরম ভূলের শিকার হয়েছে এবং যে পথে যাত্রা করছে তা হচ্ছে এক মারাত্মক বিপদসংকুল পথ। তবে তারা কী আদৌ সে পথে নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রেখে পতনের শিকার হবে ? কেননা, তারা অন্যদের প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করেছে এবং তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। কোন ধরনের যুক্তি, আইন ও বিবেক এমন ফায়সালা করতে পারে ?

স্মরণীয়

পরিশেষে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, যদিও এ ঐতিহাসিক খুতবাটি একটি বিশেষ সময়ে এবং আলী (আঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এটি সর্বকাল, যুগ ও শতাব্দী ধরে সমগ্র মুসলমানদের জন্য এক মহান শিক্ষা হিসেবে বহাল থাকবে। যাতে করে কেউ যেন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র উদাসীন ও অনীহা প্রকাশ এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে কোনরূপ আপোস না করে। সাথে সাথে কেউ যেন এটাকে কোন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ধারণা না করে। আর গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেন কখনও শ্রেষ্ঠত্বের উপর অশ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য না দেয়। পক্ষান্তরে যদি এমনটি সম্পাদন করে, তবে অবশ্যই তাদেরকে নিজেদের নিন্দনীয় কর্মের অশুভ পরিণতির প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। আর জেনে রাখা উচিত যে, অনুপযুক্ত, স্বৈরাচারী ও তাগুত রাজতন্ত্রের করুণ পরিণতি তাদেরকে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হবে। অতঃপর নিজেদের অবহেলা ও অনীহার কারণে অনুশোচনায় অশ্রু ঝড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। যে অশ্রু কেবল লজ্জা, অনুশোচনা ও অপমাননাই বয়ে আনবে।